সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

নবী জীবনের বৈশিষ্ট্য

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ভাষান্তরেঃ আ ন ম লুৎফর রহমান ফারুকী

আধুনিক প্রকাশনী

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৫৮

৬ষ্ঠ প্রকাশ

সফর	১৪২৪
চৈত্র	১৪০৯
এপ্রিল	২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা।

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

سیرت کا پیغام-এর বাংলা অনুবাদ

NABI JIBONER BAYSISTA. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 6.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নবী জীবনের বৈশিষ্ট্য

জনাব ভাইস চ্যান্সেলর ও ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সভাপতি! আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে আপনাদের এ সভায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনের ওপর যৎসামান্য আলোচনা করার জন্যে। এ বিষয়ে যুক্তির ধারা অনুসারে কিছু বলতে চাইলে সর্বপ্রথম আমাদের সামনে এ প্রশ্ন দাঁড়াবে, শুধু একজন নবীর জীবনেতিহাস আলোচনা হবে কেন? অন্য কারও জীবন নিয়ে কেন নয়? এবং নবীদের মধ্যে কেবলমাত্র আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন-যাপনের কথাই বা কেন? অন্য কোন নবী বা ধর্মনেতার জীবনালেখ্য কেন নয়? সর্ব প্রথম এ প্রশ্নের জবাব দেয়া এজন্য প্রয়োজন যে, আমাদের সামনে যেন একথা পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় যে, আসলে আধুনিক বা প্রাচীন কালের কোন নেতার চরিত্রে নয় বরং একজন নবীর জীবনীতেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এবং অন্য কোন নবী বা ধর্মনেতার জীবনে নয় বরং মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনেই আমরা নির্ভুল ও পূর্ণাংগ হেদায়াত লাভ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে আমরা সে হেদায়াতের মুখাপেক্ষী।

খোদায়ী হেদায়াতের প্রয়োজনীয়তা

একথা অনস্বীকার্য সত্য যে, জ্ঞানের উৎস হচ্ছে ঐ মহানসত্তা যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে জাতিকে পাঠিয়েছেন। সে মহানসত্তা

---

২২ শে অক্টোবর ১৯৭৫ ইং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ কর্তৃক আয়োজিত সীরাত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের বাংলানুবাদ

ব্যতীত বিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্ব জানা এবং মানুষের প্রকৃতি বোঝা ও এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা কার পক্ষে সম্ভব হতে পারে? স্রষ্টাই তার সৃষ্টির সাথে পূর্ণাংগভাবে পরিচিত। সৃষ্টি যদি কোন জ্ঞান লাভ করে তাহলে তাও স্রষ্টার দেয়া জ্ঞানেরই অংশ মাত্র। তার নিজের কাছে এমন কোন উৎস নেই, যার মাধ্যমে সে নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে সক্ষম হবে।

এ সম্পর্কে দু'টি বিষয়ের ব্যবধান জেনে নেয়া চাই, যেন আলোচনাতে কেউ বিভ্রান্ত না হয়ে যায়।

এক ধরনের বিষয় এমন আছে যা আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি এবং তা দিয়ে আয়ত্ত করা জ্ঞানের মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে নতুন নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এ ধরনের বিষয় জানতে হলে ঐ মহান সত্তার পক্ষ থেকে সরাসরি কোন শিক্ষার প্রয়োজন করে না। বিষয়টি আপনার নিজের চিন্তা-ভাবনা, আবিষ্কার-অনুসন্ধান ও গবেষণার আওতায়। এটা আপনার আয়ত্তে এজন্যে রাখা হয়েছে যেন আপনি আপনার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বস্তু সমূহ খোঁজ করে করে বের করেন এবং এতে কর্মশক্তি অনুসন্ধান করেন ও এর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আবিষ্কার করেন, এবং এ পথে অগ্রসর হতে থাকেন। এ কাজেও আপনার স্রষ্টা আপনাকে একা ছেড়ে দেবেন না, তিনি অলক্ষ্যে থেকে অবিরত তাঁর সৃষ্ট জগতের সাথে আপনাকে পরিচয় করাতে থাকবেন, জ্ঞানের নতুন নতুন দুয়ার আপনার সামনে উন্মুক্ত করতে থাকবেন। এবং কোন কোন সময় এলহামের মাধ্যমে কোন-না কোন ব্যক্তিকে এমন এমন বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন যাতে কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার বা কোন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা তার পক্ষে সহজ হয়। কিন্তু তবু এটাও মানুষের জ্ঞানেরই আয়ত্তাধীন, যার জন্যে কোন নবী অথবা কিতাব আসার প্রয়োজন নেই। এ

গন্ডির মধ্যে যা কিছু জানা প্রয়োজন তা অর্জন করার উপায়-উপকরণ মানুষকে দিয়ে দেয়া হয়েছে।

অন্য ধরনের বিষয়গুলো এমন যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের আওতার বাইরে। যা অনুভব আমরা কিছুতেই করতে পারি না। না ওজন করা যায় আর না পরিমাপ করা সম্ভব। না নিজেদের অর্জিত কোন জ্ঞানের দ্বারা তা অনুভব করতে পারি। যদি কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাও কেবল আন্দাজ-অনুমানের ওপর নির্ভর করেই সম্ভব- যাকে কোন জ্ঞান বলা যেতে পারে না। এটাই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত যার সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধবাদকেও তাঁরা নিজেরাই সঠিক বলতে পারছেন না- যারা এ মতবাদ প্রচার করেছেন, এবং যদি তারা নিজেরাই নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বুঝতে পারেন তাহলে তার ওপর না নিজেরা প্রত্যয় স্থাপন করতে পারেন, না অন্যদেরকে প্রত্যয় স্থাপন করার জন্যে বলতে পারেন।

নবী (আঃ)-দেরকে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা

এ সীমানায় জ্ঞানের আলো যদি পৌছে তাহলে তা কেবল আল্লার নির্দেশ অনুসারেই পৌছতে পারে। কারণ তিনি নিগূঢ় তত্ত্বের জ্ঞান রাখেন। এবং যে সূত্রে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ জ্ঞান সরবরাহ করে থাকেন তা হচ্ছে 'ওহী' বা প্রত্যাদেশ। ওহী কেবলমাত্র নবী (আঃ)-দের ওপরই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা আজ পর্যন্ত এমন করেননি যে, একটি বই লিখে সবার হাতে দিয়ে বলে দিয়েছেন যে, এ বইখানি পড়ে দেখ, তোমার ও এ বিশ্বের তত্ত্ব কি? এবং এ তত্ত্ব অনুসারে জগতে তোমার কর্মপন্থা কি হওয়া চাই। এ জ্ঞান মানুষের কাছে পৌছানোর জন্যে তিনি সব সময় নবী (আঃ)-দেরকেই মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করেছেন। যেন তারা কেবল শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত না হন বরং তাকে বুঝিয়েও দেন এবং তদনুযায়ী কাজ করেও দেখান। আর এ শিক্ষা

গ্রহণকারীদেরকে নিয়ে এমন এক সমাজ গঠন করেন যার প্রতিটি বিভাগ ঐ শিক্ষার জীবন্ত প্রতীক হয়ে ফুটে ওঠে।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আমরা পথ প্রাপ্তির জন্যে একমাত্র নবী (আঃ)-এর জীবনালোচনার মুখাপেক্ষী। কোন অনবী যদি নবীর অনুসারী না হয় তাহলে সে যত বড় বিজ্ঞই হোক না কেন সে আমাদের নেতা হতে পারে না। কারণ তার কছে গূঢ় তত্ত্বের জ্ঞান নেই। আর যার কাছে গূঢ় তত্ত্বের জ্ঞান নেই সে কখনও আমাদেরকে নির্ভুল ও সঠিক জীবন ব্যবস্থা দিতে পারে না।

মুহাম্মাদ (সঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবীর নিকট হেদায়াত না পাওয়ার কারণ

এখন এ প্রশ্ন আলোচনা করা যাক যে, যে সমস্ত মনীষীগণকে আমরা নবী বলে মনে করি এবং যে সমস্ত ধর্ম নেতাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে, তারা হয়ত নবী ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে আমরা কেবলমাত্র মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জীবন-কথার মহিমা গ্রহণের চেষ্টাই বা কেন করি? এ কি কোন সংকীর্ণতার ফল, না এর পেছনেও কোন কারণ আছে?

আমার মতে এর একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত নবী সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ আছে, তাঁদেরকে যদিও আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি ও নবী হিসেবে মানি কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন একজনেরও শিক্ষা এবং জীবন-কথা আমাদের কাছে পৌঁছেনি। যার আলোকে আমরা তাঁদেরকে অনুসরণ করতে পারি, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসহাক, হযরত ইউনুস, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ) নিঃসন্দেহে নবী ছিলেন এবং আমরা তাঁদের সবার ওপর ঈমানও রাখি। কিন্তু তাঁদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া

কোন গ্রন্থ আজ আর অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় বর্তমান নেই, যার থেকে আমরা পথনির্দেশ পেতে পারি। এবং তাঁদের মধ্যে কোন একজনের জীবন-কথাও নির্ভুলভাবে ও বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কাছে পৌছেনি যা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগে নির্দেশক বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। যদি এসব নবীদের শিক্ষা ও জীবন-কথা সম্পর্কে কেই কিছু লিখতে চায় তা হলে সে কয়েক পাতা ব্যতীত কিছুই লিখতে পারবে না। আর তাও সম্ভব হবে একমাত্র কোরআনের সাহায্যে। কারণ, কোরআন ব্যতীত তাঁদের সম্পর্কে নির্ভেজাল তথ্য অন্য কোথায়ও নেই।

ইহুদী ধর্মগ্রন্থে নবী (আঃ)-দের অবস্থা

হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর পরবর্তী নবীদের জীবন-কথা এবং তাঁদের শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এসব বাইবেলের আদি পর্বে (old testament) বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাইবেল পর্যালোচনা করে দেখুন। আসল তওরাত যা হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো, খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বাইতুল মোকাদ্দাস ধ্বংসের সাথে সাথে তাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর এরই সাথে অন্যান্য নবীদের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহও বিনষ্ট হয়ে যায়। যা এর পূর্বে নাজিল হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে যখন বনী ইসরাঈলগণ বাইবেলের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিলিস্তিন পৌছে তখন হযরত ওজায়ের (EZRA) আরও কয়েকজনের সাহায্যে হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনবৃত্তান্ত ও বনী ইসরাঈলের ইতিহাস রচনা করেন এবং এতে তওরাতের ঐ সমস্ত আয়াত বা শ্লোকও স্থান বিশেষে উল্লেখ করেন। যেসব শ্লোক তাঁর ও তাঁর সংগীগণের হাতে ছিলো। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে শুরু করে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি (অজ্ঞাত) ঐ সমস্ত নবীদের গ্রন্থাদি (অজ্ঞাত সূত্রে) রচনা করেন যা তাদের

থেকেও কয়েক শতাব্দী অতীত হয়ে যায়। যেমন খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে কোন এক ব্যক্তি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নামে এক গ্রন্থ রচনা করে বাইবেলের সাথে যোগ করে দেয়। অথচ তিনি খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতকের নবী ছিলেন। 'যবুর' হযরত দাউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর শত বছর পর লেখা হয়ে থাকে এবং এতে হযরত দাউদ (আঃ) ছাড়াও প্রায় ১শ'জন কবির কাব্য যোগ করে দেয় হয়। হযরত সোলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যু হয় ৯৩৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে। অথচ সোলাইমানী প্রবাদসমূহ ২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে লেখা হয় এবং তার সাথে আরও অনেক জ্ঞানীজনের উপকথা সংকলন করে দেয়া হয়।

মূল কথা হচ্ছে, বাইবেলের কোন গ্রন্থের সনদই ঐ সমস্ত নবী (আঃ)-দের কাল পর্যন্ত পৌছে না, যেসব তাঁদের বলে দাবী করা হয়, তার ওপর হিব্রু বাইবেলের এ সমস্ত গ্রন্থ ৭০ খৃষ্টাব্দে বাইতুল মোকাদ্দাসের দ্বিতীয় বার বিধস্ত হয়ে যাবার সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায় এবং কেবল মাত্র এর গ্রীক অনুবাদ টিকে থাকে। যা ২৫৮ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১ম খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অনূদিত হয়েছিলো। হিব্রু বাইবেল ২য় শতকে ইহুদী পন্ডিতগণ ঐ সমস্ত পান্ডুলিপির সাহায্যে সম্পাদনা করেন যা নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। গ্রন্থটির প্রাচীনতম সংখ্যা যা আজ পাওয়া যায় তা ৯১৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়েছিলো। এটা ব্যতীত আর কোন হিব্রু গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। মৃত সাগরের (dead sea) নিকট কোমরান গুহায় যে হিব্রু তফসিল (scrolls) পাওয়া যায় তা'ও অনধিক ২য় অথবা ১ম খৃষ্টপূর্বাব্দের লেখা। এতেও বাইবেলের কয়েকটিমাত্র বিক্ষিপ্তাংশ পাওয়া যায়। বাইবেলের প্রথম পাঁচখানা গ্রন্থের যে সংকলন সামেরীদের (Samaritans) কাছে প্রচলিত তার প্রাচীনতম সংখ্যা ১১শ খৃষ্টাব্দের লেখা। গ্রীক অনুবাদ যা ৩য় ও ২য় শতক খৃষ্টপূর্বাব্দের তাও আবার অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। এবং ঐ অনুবাদ থেকেই ল্যাটিন ভাষায় ২য় ও ৩য় খৃষ্টাব্দে অনূদিত হয়। হযরত মূসা [illegible]

(আঃ) ও তাঁর পরবর্তী নবীদের জীবনকথা ও শিক্ষা সম্পর্কে এসব তথ্য আমরা কোন মানদন্ডে বিচার করে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারি?

এ ছাড়া ইহুদীদের মধ্যে মুখে মুখে শোনা কিছু বর্ণনাও পাওয়া যেতো, যাকে মৌখিক বিধান (Oraldaw) বলা হতো। সেগুলোও ১৩/১৪শ বছর পর্যন্ত অলিখিত অবস্থায় থাকে। খৃষ্টীয় ২য় শতকের শেষের দিকে ও ৩য় শতকের প্রথম দিকে রবী ইহুদা বিন শমুন' এগুলোকে 'মিশনা' নাম দিয়ে পুস্তকের আকার দেন। ফিলিস্তিনি ইহুদীগণ এর একখানা ব্যাখ্যা হালকাহ (Halkah) নামে এবং বাবেলী পন্ডিতগণ আগাদাহ (Aggadah) নামে যথাক্রমে ৩য় ও ৫ম শতকে লেখেন এবং এ তিনখানা গ্রন্থের একত্রে নাম দেয়া হয় 'তালমূদ'। এর বর্ণনাকারীদের কোন সনদ নেই যার বলে মানা যেতে পারতো যে, কোন কোন ব্যক্তি কার কার থেকে শুনে এর বর্ণনা করেছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) ও খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ

হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবনাচরণ এবং শিক্ষার অবস্থাও একই রূপ। মূল ইনজীল, যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো তা মৌখিকভাবেই জনগণকে শোনানো হয়েছিলো এবং তাঁর শিষ্যগণও মৌখিকভাবেই তা অন্যদের কাছে এমনভাবে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিজের বাণী ও ইনজীলের বাণী একাকার করে দেয়া হয়। পুস্তকের কোন একটি কাব্যও হযরত ঈসা (আঃ) বা তাঁর যুগে অথবা তাঁর পরেও লেখা হয়নি, বরং লেখার কাজ ঐ সমস্ত খৃষ্টানগণ শুরু করে যাদের ভাষা ছিলো গ্রীক। অথচ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতৃভাষা সিরিয়ান (Syrian) অথবা আরামী (Aramic) ছিলো। তার শিষ্যগণও ঐ ভাষাতেই কথা-বার্তা বলতেন। গ্রীক ভাষাভাষী অনেক গ্রন্থকার ঐ সমস্ত

বর্ণনা আরামী ভাষায় শুনে গ্রীক ভাষায় গ্রন্থাবদ্ধ করে নেয়। এ সমস্ত গ্রন্থকারের কোন গ্রন্থই খৃষ্টীয় ৭০ সালের পূর্বে রচিত হয়নি এবং এদের মধ্যে এমন কোন গ্রন্থাকার নেই যিনি কোন ঘটনা বা হযরত ঈসা (আঃ)–এর কোন বাক্য বর্ণনাকারীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। যাতে সিদ্ধান্ত করা যেতো যে, তারা কোন্ উক্তি কার কাছে শুনে বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু তাদের লেখা কোন গ্রন্থই আজ আর সংরক্ষিত নেই। বাইবেলের নতুন নিয়মের (New testament) কয়েক হাজার গ্রীক সংখ্যা একত্র করা হয়েছিলো কিন্তু তন্মধ্যে এক খানাও পাওয়া যায়নি, যা ৪র্থ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লেখা হয়েছে। বরং অধিকাংশই একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের লেখা। মিশরে পেপিরাসের ওপর লেখা যে সমস্ত বিক্ষিপ্তাংশ পাওয়া যায় তার কোনটিই ৩য় শতকের চাইতে পুরাতন নয়। গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ কে, কখন ও কোথায় করেছে তার হদিস আজও পাওয়া যায়নি। ৪র্থ শতকে পোপের আদেশে এসব পুনর্লিখিত হয়। অতপর ১৬ শতকে এগুলো বাদ দিয়ে গ্রীক থেকে ল্যাটিনে আর এক নতুন অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। গ্রীক থেকে সিরিয়ান ভাষায় চার ইন্জীলের অনুবাদ সম্ভবত ২শ' খৃষ্টাব্দে করা হয়েছিলো। কিন্তু এরও প্রাচীনতম সংখ্যা যা আজকাল পাওয়া যায় তা ৪র্থ শতকের লেখা এবং ৫ম শতকের যে হস্তলিখিত পান্ডুলিপি আজকাল পাওয়া যায় সেটাও এর থেকে অনেকটা আলাদা। সিরিয়ান থেকে আরবীতে যে অনুবাদ করা হয়েছে তার কোনটাই অষ্টম শতকের আগের নয়। এও এক আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় ৭০ খানা ইন্জীল লেখা হয়েছিলো অথচ তার মাত্র চারাখানাকেই খৃষ্টান ধর্ম নেতাগণ গ্রহণ করেছেন এবং বাকীগুলো করেছেন প্রত্যাখ্যান। জানিনা এ গ্রহন করার পিছনেই বা কি কারণ আর বর্জন করারই বা কারণ কি? এসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে কি হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর জীবন মহিমা এবং শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে?

অন্যান্য ধর্ম নেতাদের অবস্থা এর চাইতে কোনভাবে আলাদা নয়। যেমন জরথুস্ত, যার জন্মকালও আমাদের সঠিকভাবে জানা নেই। বড়জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, আলেকজান্ডারের ইরান বিজয়ের আড়াই শত বছর পূর্বে তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলো অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর সাড়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে। তাঁর গ্রন্থ আবেস্তা তার মূল ভাষায় আজ দুষ্প্রাপ্য এবং ঐ ভাষাও আজ মৃত, যে ভাষায় তা লেখা অথবা বর্ণনা করা হয়েছিলো। খৃষ্টীয় নবম শতকে তার কিছু অংশের ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ ৯ খন্ডে করা হয়েছিলো। কিন্তু তারও আবার প্রথম দু'খন্ড বিনষ্ট হয়ে যায় এবং আজকাল তার প্রাচীনতম সংখ্যা পাওয়া যায় তাও আবার ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের লেখা। এ তো হলো জরথুস্তের দেয়া ধর্মগ্রন্থের অবস্থা। বাকী রইলো তাঁর জীবন বৃত্তান্ত। সে সম্পর্কেও আমাদের এর চাইতে বেশী জানা নেই যে, ৪০ বছর বয়সে তিনি ধর্ম প্রচার শুরু করেন। দু'বছর পর সম্রাট গোস্তসব তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর ধর্ম সরকারী ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি ৭৭ বছর জীবিত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যতই দিন অতীত হতে লাগলো তাঁর জীবন সম্পর্কে অদ্ভুত উপাখ্যান রচিত হতে লাগলো। যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

দুনিয়ার বিখ্যাত ধর্মনেতাদের মধ্যে বুদ্ধ ছিলেন আর একজন। জরথুস্তের মত তাঁর সম্পর্কেও ধারণা এই যে, তিনি হয়ত নবী ছিলেন। কিন্তু তিনি আদতেই কোন গ্রন্থ দিয়ে যাননি। না তার অনুসারীগণ কোন দাবী করেন যে, তিনি কোন গ্রন্থ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর এক শত বছর পর তাঁর বাণী ও জীবন কথা সংগ্রহ করার কাজ আরম্ভ হয় এবং তা কয়েক শতাব্দী চলতে থাকে। কিন্তু এ ধরনের যতখানি গ্রন্থ বুদ্ধ ধর্মের মূলগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত তার একটাতেও বর্ণনা পরম্পরা দেয়া হয়নি। যদ্বারা জানা যেত যে, কোন সূত্রে এসব বাণী ও জীবন কথা সংগ্রাহকগণের হাতে পৌছেছে।

এ পর্যন্ত বুঝা গেলো যে, অন্যান্য নবী ও ধর্মীয় নেতাগণকে অনুসরণ করতে চাইলেও তাঁদের সম্পর্কে জানার এমন কোন উপায় নেই যদ্দারা তাঁদের শিক্ষা ও জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ের সাথে সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারি। এরপর আমাদের সামনে এ ছাড়া আর কোন উপায় বাকী থাকে না যে, আমরা এমন একজন নবীর সন্ধান করি যিনি কোন নির্ভরযোগ্য ও নির্ভেজাল গ্রন্থ রেখে যান এবং যার বিস্তারিত জীবন-কথা, বাণী ও কর্ম বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। যদ্দারা আমরা পথ নির্দেশ পেতে পারি বা তা অনুসরণ করতে পারি। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব সারা বিশ্বের ইতিহাসে কেবল মাত্র একজনই পাওয়া যায়। আর মুহাম্মদ (সঃ)-এর ব্যক্তিত্বই এ সমস্ত গুণের সমষ্টি।

তিনি একখানি গ্রন্থ (কোরআন) এ দাবীর সাথে পেশ করেছেন যে, এসব আল্লাহর বাণী যা আমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ গ্রন্থ পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রত্যয়ের সাথে অনুভব করি যে, এতে কোন ভেজাল মিশ্রিত হয়নি। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন বাক্যও এতে শামিল হয়নি। বরং তাঁর বাণী সমূহ এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হয়েছে। বাইবেলের মত তাঁর জীবন কথা, আরবদের ইতিহাস এবং সমকালীন ঘটনাবলী এতে আল্লার বাণীর সাথে একাকার করে দেয়া হয়নি। এ সমস্ত নির্ভেজাল আল্লাহর বাণী। এর মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও এক বর্ণ সংযোগ করা হয়নি। তাঁর বাক্য থেকে এক অক্ষরও কমানো হয়নি। তা রাসূল (সঃ)-এর যুগ থেকে একই অবস্থায় আমাদের যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে।

এ গ্রন্থ যখন থেকে নবী (সঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ হতে থাকে, তখন থেকেই তিনি তা লিখিয়ে নিতে থাকেন। যখনই কোন প্রত্যাদেশ আসতো তখনই তিনি তাঁর নিজস্ব কোন লেখককে ডাক দিতেন এবং তাকে দিয়ে বাণী সমূহ লিখিয়ে নিতেন, লেখা শেষ হলে তাঁকে পড়ে শোনানো হতো, যখন

তিনি নিশ্চিন্ত হতেন যে, লেখক সঠিকভাবে তা লিখেছেন, তখন তিনি কোন সংরক্ষিত স্থানে সেসব রেখে দিতেন। প্রতিটি অবতীর্ণ ওহী সম্পর্কে তিনি লেখককে বলে দিতেন যে, কোন্ সূরার সাথে ও কোন্ কোন্ আয়াতের আগে বা পরে তা গ্রথিত করা হবে। এভাবে তিনি নিজেই কোরআন গ্রথিত করতে থাকেন যা পরে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

অতপর নামায সম্পর্কে ইসলামের উদয়লগ্ন থেকেই এ নির্দেশ ছিলো যে, নামাযে কোরআন মজীদ বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। এজন্যে সাহাবাগণ তা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই মুখস্থ করে নিতেন। অনেকেই সম্পূর্ণ কোরআন কণ্ঠস্থ করে নেন এবং অনেক সংখ্যক সাহাবা এমন ছিলেন যারা কোরআনের অংশ বিশেষ নিজ নিজ স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন। এ ছাড়া ঐ সমস্ত সাহাবা যাঁরা লেখাপড়া জানতেন, তাঁরা কোরআনের বিভিন্ন অংশ নিজেরাই লিখে রাখতেন, এভাবে কোরআন রাসূল (সঃ)-এর সময়ই চার প্রকারে সংরক্ষিত হয়।

একঃ তিনি (নবী) নিজেই ওহী লেখককে দিয়ে আদ্যন্ত লিখিয়ে নেন।

দুইঃ অনেক সাহাবা সম্পূর্ণ কোরআন এক এক অক্ষর সহ কণ্ঠস্থ করে নেন।

তিনঃ এমন কোন সাহাবী (রাঃ) ছিলেন না যিনি কোরআনের কোন-নাকোন সূরার কিছু না কিছু অংশ কণ্ঠস্থ করে রাখেননি, কারণ তাঁকে তা নামাযে পড়তেই হতো। তাঁদের সংখ্যা কত ছিলো সে সম্পর্কে এ দিয়ে অনুমান করুন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবা উপস্থিত ছিলেন।

চারঃ লেখাপড়া জানা অনেকেই কোরআন লিখে নেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পড়ে শোনান ও তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

অতএব এটা এক অনস্বীকার্য সত্য যে, আজকের কোরআন, যা আমাদের কাছে বর্তমান আর এক এক অক্ষর সহ ঐ কোরআন, যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লার বাণী হিসেবে পেশ করেছেন, হযরত (সঃ)–এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) হাফেজে কোরআনগণকে ও কোরআনের পান্ডুলিপিসমূহ একত্রিত করেন এবং তার সাহায্যে কোরআনের এক পূর্ণাংগ সংকলন প্রস্তুত করে নেন। হযরত ওসমান (রাঃ)–এর সময় এ সংকলন নকল করে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারীভাবে প্রেরণ করা হয়, উহার দু'খানা কপি আজও বর্তমান আছে। একখানা ইস্তাম্বুলে ও অন্যখানা তাসখন্দে। কেউ দেখতে চায় তো কোরআনের যে কোন একখানা ছাপানো কপি নিয়ে সেগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতে পারে, কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হবে না। আর ব্যতিক্রম হতে পারে কি করে, যেখানে রাসূল (সঃ)–এর যুগ থেকে শুরু করে প্রতি যুগে লক্ষ কোটি হাফেজে কোরআনের সমর্থন বিদ্যমান। এক অক্ষরও যদি কেউ এদিক ওদিক করে তখন এ সমস্ত হাফেজগণ তার ভূল ধরে দেবেন। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইনস্টিটিউট মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করে প্রত্যেক যুগের লেখা কোরআন মজীদের হস্তলিখিত ও মুদ্রিত ৪২ হাজার কপি সংগ্রহ করে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এ সবের ওপর গবেষণা চালানো হয়। অতপর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়েছে যে, এ সংকলনগুলোতে লেখার ত্রুটি ব্যতীত অন্য কোন ব্যবধান বা অসংগতি নেই। অথচ এগুলোতে প্রথম শতক (হিজরী) থেকে চুতর্দশ শতকের সংকলনের সমাবেশ ছিলো এবং দুনিয়ার প্রতিটি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। দুঃখের বিষয় ২য় মহাযুদ্ধের সময় যখন জার্মানীর ওপর বোমা বর্ষণ করা হয় তখন ঐ ইনস্টিটিউট ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তার গবেষণার ফল দুনিয়া থেকে আজও মুছে যায়নি।

আর একটি কথা কোরআন সম্পর্কে জেনে রাখুন যে, যে ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তা আজও একটি জীবন্ত ভাষা। ইরাক থেকে মরক্কো পর্যন্ত প্রায় ১২ কোটি মানুষ আজও মাতৃভাষা হিসেবে এ ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এবং অনারব বিশ্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ এ ভাষা অধ্যয়ন করে থাকে। আরবী ভাষার ব্যাকরণ, তার শব্দকোষ, বাক ভঙ্গি ও পরিভাষা সমূহ ১৪ শ' বছর থেকে অপরিবর্তীত অবস্থায় চলে আসছে। আজও প্রত্যেক আরবী জানা ব্যক্তি কোরআন পড়ে ঠিক তেমনই বুঝে থাকেন যেমন বুঝতেন ১৪শ' বছর পূর্বেকার একজন আরব। এ হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ)-এর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা তিনি ব্যতীত অন্য কোন নবী বা ধর্ম নেতার মধ্যে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্যে যে গ্রন্থ তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তা আজও মূল বচন সহ কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন ব্যতীত বর্তমান।

সীরাত ও সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ

এবার আর একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এতেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যান্য নবী ও ধর্মনেতাদের মধ্যে অদ্বিতীয়। আর তা হচ্ছে এই যে, তাঁর ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থের মত তাঁর জীবন-কথাও সংরক্ষিত আছে। এতে আমরা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে হেদোয়াত লাভ করতে পারি। শিশুকাল থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত যত লোক তাঁকে দেখেছে, তাঁর কাজ-কর্ম লক্ষ্য করেছে, তাঁর কথা-বার্তা শ্রবণ করেছে, তাঁর ভাষণ শুনেছে, তাঁকে কোন বিষয়ে আদেশ করতে ও কোন কিছু থেকে নিষেধ করতে শুনেছে, তা অসংখ্য লোক স্মরণ রেখেছে এবং তাদের উত্তর পুরুষদের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এ ধরনের লোকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ যারা স্বচক্ষে ও স্বকানে শোনা ঘটনাবলী তাদের বংশধরদের

কাছে বর্ণনা করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও কোন কোন নির্দেশ লিখে দিয়েছেন, বা বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেছেন যা পরবর্তী কালে পাওয়া যায়। সাহাবীদের মধ্যে কমপক্ষে ৬ জন এমন ছিলেন যারা তাঁর হাদীস লিখে তাঁকে পড়ে শোনাতেন যেন তাতে কোন ভূল-ভ্রান্তি না থাকে। এ সমস্ত লিখাও পরবর্তী কালের লোকদের হস্তগত হয়। হুজুর (সঃ)-এর মৃত্যুর পর প্রায় ৫০ জন সাহাবা (রাঃ) তাঁর জীবন-কথা, ঘটনাবলী ও বাণী সমূহ লিখিত আকারে সংগ্রহ করেন এবং জ্ঞানের এ ভান্ডারটিও ঐ সমস্ত লোকদের হাতে পৌঁছে, যারা পরবর্তী কালে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ সমাধা করেন। যে সমস্ত সাহাবা (রাঃ) জীবন-কথা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় মৌখিক বর্ণনা করেন তাদের সংখ্যাও যেমন আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, কোন কোন গবেষকের মতে ১ লক্ষ হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ সর্বশেষ হজ্জ যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক সমাধা হয়, যাকে হুজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জ বলা হয়ে থাকে, তাতেও এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এত লোক তাঁকে হজ্জ করতে দেখেছেন, তাঁর হজ্জ করার পদ্ধতি লক্ষ্য করেছেন এবং ঐ ভাষণও শুনেছেন যা হুজ্জাতুল বিদার সময় তিনি দিয়েছেন। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, এত লোক এমন গুরুত্বপূর্ণ সময় তাঁর সাথে হজ্জ করেছেন আর নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবার পর তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীরা তাঁদের কাছে এ সফর সম্পর্কে কোন কিছুই জানতে চাননি? কিংবা হজ্জের নিয়ম কানূন জিজ্ঞেস করেননি। এতেই অনুমান করা যেতে পারে যে, রাসূল (সঃ)-এর মত মহা মানবের এ জগত থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পর মানুষ কত আগ্রহের সাথে তাঁর অবস্থা, বাণী এবং নির্দেশাবলী ঐ সমস্ত লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে থাকবেন, যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁর বাণী স্বকর্ণে শুনেছেন।

রাসূল (সঃ) থেকে যে সমস্ত বর্ণনা পরবর্তীকালের লোকদের কাছে পৌঁছেছে, তাদের সম্পর্কে প্রথম থেকেই এ নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে যে, যিনি রাসূলের বরাত দিয়ে কোন কথা বলতেন তখন তাঁকে বলতে হতো যে, তিনি একথা কার কাছে শুনেছেন এবং সে যার কাছে শুনেছে সে কার কাছে শুনেছে? এভাবে একে অন্যের সূত্র বর্ণনা করতে হতো, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সত্যিই একথা রাসূল (সঃ) বর্ণনা করেছেন। যদি বর্ণনার সূত্র কোথাও বিচ্ছিন্ন দেখা যেতো তা হলে মনে করা হতো যে, এ বর্ণনা নির্ভুল হবার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আর সূত্র যদিও রাসূল (সঃ) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন থাকে অথবা মাঝে কোন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়, তখন ঐ বর্ণনাও গ্রহণ করা হতো না। এ বৈশিষ্ট্য কেবল মাত্র নবী (সঃ)-এর জীবনে পাওয়া যায় যে, তাঁর সম্পর্কে কোন কথাই প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা হয়নি। এবং সূত্র সম্পর্কেও কেবল এটা দেখা হয়নি যে, হাদীসের বর্ণনার সূত্র রাসূল পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা বরং এটাও দেখা হয়েছে যে, বর্ণনাকারীরা সবাই নির্ভরযোগ্য কিনা। এজন্যে বর্ণনাকারীদের জীবনাবস্থা পর্যালোচনা করা হয় এবং এ সবের ওপরও গ্রন্থাদি রচনা করা হয়, সে সমস্ত গ্রন্থ পাঠে ধারণা করা যেতে পারে যে, কে নির্ভরযোগ্য ছিলো আর কে ছিলো না। কার চরিত্র ও কর্ম কেমন ছিলো। কার স্মরণশক্তি নির্ভুল ছিলো আর কার ছিলো না। কে ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছে যার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে, আর কে সাক্ষাত ছাড়াই তার নামে হাদীস বর্ণনা করে গেছে। এমন বিস্তারিতভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে তথ্য জমা করা হয়েছে, যে তথ্যের সাহায্যে আজও আমরা এক একটি হাদীস যাচাই করে বলতে পারি যে, এটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, আর এটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করা হয়নি।

মানবতার ইতিহাসে কি এমন কোন ব্যক্তি আছেন যার জীবনী এমন নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে? এবং এর কি কোন তুলনা আছে যে,

এক জনের জীবনীর গবেষণার জন্যে ঐ সমস্ত হাজার হাজার লোকের জীবনী সম্পর্কেও গ্রন্থাদী রচনা করা হয়েছে, যারা ঐ এক ব্যক্তির জীবন কথা বর্ণনা করেছ। বর্তমান কালে ঈসায়ী ও ইহুদী আলেমগণ হাদীসের নির্ভুলতাকে সংশয়িত করার জন্যে আদা পানি খেয়ে লেগে গেছে। এর আসল কারণ এ হিংসায় যে, তাদের ধর্মের নেতাদের জীবনের কোন তথ্য নেই। এ গাত্রদাহের কারণে তারা ইসলাম, কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর সমালোচনার ব্যাপারে জ্ঞান-বিশ্বস্ততাকে (Intellectual Honesty)-ও মাচায় তুলে রাখে। হুজুরের জীবনের প্রতিটি দিকই জ্ঞাত।

সীরাতে রাসূলের কেবল মাত্র এটাই বৈশিষ্ট্য নয় যে, তা অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কাছে পৌছেছে বরং ইহাও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, উহাতে তাঁর জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের এত বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান যে, ইতিহাসের অন্য কোন ব্যক্তির জীবনে তা পাওয়া যায় না। তাঁর বংশমর্যাদা কেমন ছিলো, নবুয়াত পাওয়ার আগে তাঁর জীবন পদ্ধতি কি ছিলো, তিনি কি ভাবে নবুয়াত প্রাপ্ত হলেন, কিভাবে তাঁর ওপর ওহী নাজিল হতো। তিনি ইসলামের বাণী কিভাবে প্রচার করতেন। সংকট ও বিরোধিতার মোকাবিলা কি ভাবে করতেন। সংগী-সাথীদেরকে কি ভাবে শিক্ষা দিতেন। তাঁর পারিবারিক জীবন কেমন ছিলো। কি ধরনের চারিত্রিক শিক্ষা তিনি দিয়ে থাকতেন। এবং তাঁর নিজের স্বভাব-চরিত্রও বা কেমন ছিলো, কিসের তিনি আদেশ দিয়েছেন এবং কি ধরনের কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। এ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ও বিস্তারিতভাবে হাদীস এবং সীরাতের কিতাব সমূহে বর্তমান। তিনি একজন সেনাপতিও ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে যতগুলে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে সে সব যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা জানতে পারি। তিনি একজন রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন এবং তাঁর শাসন ব্যবস্থার পূর্ণাংগ বর্ণনাও আমাদের কাছে বর্তমান। তিনি একজন বিচারকও ছিলেন এবং তাঁর আদালতে

পেশকৃত সমস্ত মোকদ্দমার কার্যবিবরণী আমাদের কাছে মওজুদ আছে। আর আমরা এ-ও জানতে পারি যে, কোন মোকদ্দমার রায় তিনি কি দিয়েছেন। তিনি হাটে বাজারেও বের হতেন এবং স্বচক্ষে দেখতেন যে, জনগণ কি ভাবে বেচাকেনা করে। যে কাজ অন্যায় ভাবে হতে দেখতেন তা থেকে তিনি বিরত রাখতেন এবং যে কাজ সঠিক ভাবে হতে দেখতেন তাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করতেন। মূল কথা হচ্ছে এই যে, জীবনের এমন কোন দিক বাকি নেই যে সম্পর্কে তিনি কোন পথনির্দেশ করেননি।

এ কারণেই আমরা সংকীর্ণতামুক্তভাবে জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে বলতে পারি যে, সমস্ত নবী ও ধর্ম নেতাদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ)-ই ঐ সত্তা যার কাছে বিশ্ব মানবতা হেদায়াত ও পথের দিশা পেতে পারে। কারণ তাঁর দেয়া কিতাব মূল বাক্য সহ সংরক্ষিত আছে এবং তাঁর জীবন কথাটাও সমস্ত প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটিসহ যা হেদায়াতের জন্যে প্রয়োজন, অতি বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এখন আমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, তাঁর জীবনী আমাদেরকে কি বার্তা বা পথনির্দেশ দেয়।

হুজুর (সঃ)-এর পয়গাম সমগ্র মানবতার জন্যে

তাঁর দাওয়াতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে তিনি গাত্রবর্ণ, বংশ, ভাষা ও অঞ্চলের সমগ্র ব্যবধানকে উপেক্ষা করে মানুষকে মানুষ হিসেবেই আহবান করেছেন। আর এমন কতকগুলো মূলনীতি পেশ করেন, যা সমস্ত মানুষের জন্যে কল্যাণকর। এ সকল মূলনীতি যে কেউ মানবে সে-ই হবে মুসলমান এবং সে এক বিশ্ব মুসলিম জাতিতে শামিল হয়ে যাবে। হোক তার গায়ের রং কালো কিংবা লাল, সে পূর্বের বাসিন্দা হোক বা পশ্চিমের, আরবী বা অনারব। যেখানেই কোন মানুষ পাওয়া যায়, যে কোন দেশে অথবা যে কোন জাতি বা বংশেই তার জন্ম হোক না

কেন, যে ভাষাতেই সে কথা বলুক না কেন এবং তার গায়ের চামড়া যে রংগেরই হোক না কেন, মুহাম্মদ (সঃ)–এর আহবান তার প্রতি। আর যদি সে তাঁর দেয়া মূলনীতিসমূহ মেনে নেয়, তা হলে সে সম্পূর্ণ সমানাধিকারের সাথে মুসলিম মিল্লাতে শামিল হয়ে যায়। কোন অস্পৃশ্যতা, উঁচু–নিচু, কোন বংশগত বা শ্রেণীগত ব্যবধান, কোন ভাষা বা জাতিগত ব্যবধান অথবা ভৌগলিক দূরত্ব, যার ওপর বিশ্বাসের ঐক্য কায়েম হওয়ার পর একজনকে অন্যজন থেকে আলাদা করে দেয় এ উম্মতের মধ্যে তা পাওয়া যায় না।

গাত্রবর্ণ এবং গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের উত্তম চিকিৎসা

একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এটা এত বড় কল্যাণ যা বিশ্বমানবতা লাভ করেছে, মানুষকে যে জিনিসটি সব চাইতে বেশী বিনাশ করেছে তা হচ্ছে ঐ ব্যবধান যার প্রাচীর মানুষ মানুষের মধ্যে খাড়া করা হয়েছে। কোথাও তাকে অস্পৃশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে, এ হচ্ছে অচ্ছুত, তাই সে ঐ অধিকার পাওয়ার যোগ্য নয় যা ব্রাহ্মণের জন্যে নির্দিষ্ট, কোথাও তাকে নিকেশ করে দেয়ার যোগ্য মনে করা হয়েছে, কারণ সে অষ্ট্রেলিয়া বা আমেরিকায় এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছে যখন বহিরাগতদের থেকে জমীন খালি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কোথাও তাকে ধরে ধরে গোলাম বানানো হয়েছে এবং তাকে পশুর মত খাটিয়ে নেয়া হয়েছে, কারণ সে আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার গায়ের রং কালো। অর্থাৎ মানবজাতির জন্যে গোত্র, বংশ, রং, ভাষা ও ভৌগলিক ব্যবধান প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, আর এক মহা মসীবতের কারণ হয়ে আছে। এরই ভিত্তিতে যুদ্ধ–বিগ্রহ চলতে থাকে। এক দেশ অন্য দেশের ওপর সৈন্য পরিচালনা করে, এক জাতি অন্য জাতিকে লুণ্ঠন করে, এবং সবংশে নিপাত করে ছাড়ে। নবী করীম (সঃ) এ রোগের এমন এক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন

যে, ইসলামের শত্রুরাও তা মানতে বাধ্য হয় যে, রং, বংশ ও ভৌগলিক ভেদাভেদ যে সফলতার সাথে ইসলাম দূর করেছে তার সমাধান আর কারও ভাগ্যে জোটেনি। আমেরিকার নিগ্রো বাসিন্দাদের প্রসিদ্ধ নেতা 'মালিকম একস' যে এককালে শ্বেতাকায়দের বিরুদ্ধে কৃষ্ণকায়দের চরম সংকীর্ণতাবাদীদের নেতা ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করে যখন হজ্জ করতে যান এবং দেখতে পান যে, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোক, বিভিন্ন বংশের মানুষ, বিভিন্ন দেশের লোক, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা লোক এসে জমায়েত হচ্ছে, সবাই একই ধরনের এহরামের পোশাক পরে আছে, সবাই একই ভাষায় লাব্বাইকের ধ্বনি উচ্চারণ করছে, একত্রে তাওয়াফ করছে এবং একই সারিতে দাঁড়িয়ে একই ইমামের পেছনে নামায পড়ছে। তখন তিনি চিৎকার করে বলেন যে, বর্ণ এবং বংশের সমস্যার একমাত্র সমাধান এখানেই। ওখানে নেই, যা এ যাবৎ আমরা করে আসছি। তাঁকে তো জালিমেরা হত্যা করে ফেলেছে কিন্তু তাঁর নিজের লেখা জীবনী আজও ছাপানো অবস্থায় বর্তমান, তাতে আপনি দেখতে পাবেন যে, হজ্জ থেকে তিনি কতটুকু প্রভাব গ্রহণ করেছেন।

এ হজ্জ তো হচ্ছে ইসলামের ইবাদাত সমূহের একটি। যদি কেউ চোখ মেলে ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষার প্রতি তাকায় তাহলে কোথায়ও অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলতে পারবে না যে, এটা কোন বিশেষ জাতি, গোত্র, বংশ বা শ্রেণী স্বার্থে রাখা হয়েছে। এ পূর্ণাংগ দ্বীনই এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, এ ধর্ম সমগ্র মনবতার জন্যে এবং তার দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত মানুষ সবাই সমান, যারা এর মূল নীতি গ্রহণ করে তার দেয়া বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়ে যায়। বরং এ ধর্ম অমুসলিমদের সাথেও ঐ ব্যবহার করে না যা শ্বেতাংগেরা কৃষ্ণকায়দের সাথে করেছে, যা সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহ তাদের অনুগত জাতিসমূহের সাথে করেছে, যা কমিউনিষ্ট সরকার সমূহ তাদের শাসনাধীনে অকমিউনিষ্টদের

সাথে করেছে। এমন কি নিজেদের দলের অপসন্দনীয় সদস্যদের সাথেও করেছে।

এখন আমদেরকে দেখতে হবে যে, মানবতার কল্যাণের জন্যে সে মূলনীতিগুলো কি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ) পেশ করেছেন, এবং তার ভিতর এমন কোন শক্তি নিহিত আছে, যা কেবল মাত্র মনবতার কল্যাণের নিশ্চয়তাই দেয় না, বরং সমগ্র মানব জাতিকে এক ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ করে এক উম্মত গঠন করার ক্ষমতাও রাখে।

আল্লার একত্বের ব্যাপকতম ধারণা

এখানে সর্বপ্রথম আল্লার একত্বকে স্বীকার করতে হবে, কেবল এ অর্থে নয় যে, আল্লাহ একজন আছেন। শুধু এ অর্থেও নয় যে, আল্লাহ একজনই আছেন, বরং তার অর্থ এই যে, বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এবং শাসক একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। সমগ্র বিশ্বে অন্য কোন সত্তা নেই, যার হাতে সর্বময় শাসন ক্ষমতা পুঞ্জীভূত এবং আদেশ করার ও বিরত রাখার অধিকার রয়েছে। যে হারাম করলে কোন কিছু হারাম হবে আর হালাল করলে হবে হালাল। এ ক্ষমতা তিনি ব্যতীত আর কারও কাছে নেই। কারণ তিনি স্রষ্টা ও মালিক। তাঁরই এ অধিকার আছে যে, নিজের বান্দাদেরকে তাঁর সৃষ্ট জগতে যা চাইবে অনুমতি দেবে, আর যাকে মনে চাইবে নিষেধ করবে, ইসলামের দাবী এই যে, আল্লাহকে এ হিসেবে মানতে হবে যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বান্দা বা দাস নই। আর তাঁর দেয়া বিধানের বিরুদ্ধে অন্য কেউ আমাদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার রাখে না। তাঁকে এ হিসেবে মানতে হবে যে, আমাদের মাথা তাঁর সামনে ব্যতীত অন্য আর কারও সামনে নত হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। তাঁকে এ হিসেবে মানতে হবে যে, আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ ও পরিবর্তন কেবল তিনিই করতে পারেন, মানুষ

হবে এ হিসেবে যে, আমাদের জীবন–মরণ নিরংকুশ ভাবে তাঁরই হাতে। যখনই চাইবেন মৃত্যু দিতে পারেন আর যতদিন ইচ্ছা আমাদেরকে জীবিত রাখতে পারেন। তার পক্ষ থেকে যদি মৃত্যু আসে তাহলে জগতে কোন শক্তি রক্ষা করার নেই, আর তিনি যদি জীবিত রাখেন তাহলে দুনিয়ায় কোন শক্তি মারতে পারবে না। এ হলো ইসলামের আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা। এ ধারণা অনুযায়ী যমীন থেকে আরম্ভ করে আকাশ সমূহ পর্যন্ত সারা বিশ্ব আল্লার হুকুমের অধীন এবং মানুষ যে এ বিশ্বে বসবাস করে তারও কর্তব্য হচ্ছে যে, সে যেন আল্লার অনুগত হয়ে বসবাস করে। যদি সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও আনুগত্য করা শুরু করে, তখন তার জীবন পদ্ধতি সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার পরিপন্থি হতে বাধ্য। অন্য কথায় এভাবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্ব আল্লার ইচ্ছাধীন চলছে, এ নিয়ম এমন এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যা কেহ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। এখন আমরা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইচ্ছাধীন চলতে থাকি তাহলে এর মানে এ দাঁড়াবে যে, আমাদের জীবনের গাড়ী সমগ্র বিশ্বের বিপরীত দিকে চলতে থাকবে। আর এটা এমন এক অবিরত সংঘর্ষ যা আমাদের ও বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে বিরাজ করবে।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখুন। এ ধারণা অনুসারে মানুষের জন্যে সঠিক জীবন পদ্ধতি (Way of life) শুধুমাত্র এ হবে যে, সে কেবল আল্লাহরই আনুগত্য করবে, কারণ সে সৃষ্টি এবং আল্লাহ তার স্রষ্টা, সৃষ্টজীব হিসেবে তার স্বেচ্ছাচারী হওয়াও অন্যায় এবং নিজের স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কারও দাসত্ব করাও ভুল, এ দু' পন্থার মধ্যে সে যে কোন পন্থাই গ্রহণ করুক না কেন তাতে বাস্তবতার সাথে সংঘাত হতে বাধ্য, আর বাস্তবতার সাথে সংঘাত বাঁধানোর ক্ষতি তাকেই উঠাতে হয়, যে সংঘাত করে, এতে বাস্তবতার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় না।

আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহবান

রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর আহবান এই যে, এ সংঘাত খতম কর, তোমাদের জীবন পদ্ধতি ও বিধি ব্যবস্থা ঐ হওয়া চাই যা সারা বিশ্বের, তোমরা নিজেরাই আইন অমান্যকারী হইও না, আর না অন্য কাউকেও এ অধিকার দাও যে, সে আল্লার যমীনে আল্লাহর বান্দাদের ওপর নিজের বিধান চালায়, সত্য ও সঠিক বিধান কেবল মাত্র আল্লার বিধান, আর বাকী সবই হচ্ছে বাতিল।

রাসূল (সঃ)–এর আনুগত্যের আহবান

এতে আমাদের সামনে রাসূল (সঃ)–এর দাওয়াতের আর এক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, তা হচ্ছে তাঁর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা যে, আমি আল্লার নবী এবং মানব জাতির জন্যে তিনি তাঁর বিধান আমার মাধ্যমেই পাঠিয়েছেন। আমি নিজেও সে বিধান মেনে চলতে বাধ্য। স্বয়ং আমি নিজেও সে বিধান পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অধিকার রাখি না।এ কোরআনই সে বিধান যা আমার ওপর আল্লার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, এবং আমার সুন্নাতও সে বিধান যা আল্লার আদেশ ও নির্দেশের ভিত্তিতে জারি করা হয়েছে। এ বিধানের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনতকারী সর্বপ্রথম আমি নিজে, (انا اول المسلمين)অতপর সব মানুষকে আহবান করছি যে, অন্যসব বিধানের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে এ বিধানের অনুসারে চল, আল্লাহর পর আনুগত্যের হকদার আল্লাহর রাসূল (সঃ)।

কেউ যেন এ সন্দেহের বশবর্তী না হয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নিজের সুন্নাতের আনুগত্য ও আনুসরণ কি করে করতে পারে+ যা তাঁর

নিজেরই বাণী ও কর্ম। এর রহস্য এই যে, কোরআন যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক তেমনি রাসূল হিসেবে তিনি যে সমস্ত আদেশ নির্দেশ দিতেন অথবা যে সমস্ত কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতেন অথবা যে নিয়ম তিনি নির্দিষ্ট করে দিতেন সেটাও আল্লার পক্ষ থেকেই নিষ্পন্ন হতো। একেই বলা হয় সুন্নাতে রাসূল এবং তার অনুসরণ তিনি নিজেও ঠিক সেভাবেই করতেন যেভাবে করা সমস্ত ঈমানদারদের জন্যে কর্তব্য ছিলো। এ কথাটি ঐ সময়ই পরিষ্কার হয়ে যেতো যখন বিভিন্ন উপলক্ষে সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করতেন যে, 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কি একথা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী বলছেন, না এসব আপনার নিজের রায়?' তিনি যদি জবাবে বলতেন যে, 'এ ব্যাপরটি আমার ব্যক্তিগত মত, আল্লাহর আদেশ নয়।' তখন এ ধরনের কাজে সাহাবাগণ হুজুরের রায়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন এবং কেউ কেউ নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতেন। আর তিনিও তাঁর রায় পরিবর্তন করে তাঁদের প্রস্তাব সমর্থন করতেন। এভাবে ঐ সময়ও একথা পরিষ্কার হয়ে যেতো কখন তিনি কোন কাজ করার আগে সাহাবা (রাঃ) –দের কাছে পরামর্শ চাইতেন। এ ধরনের পরামর্শ একথাই প্রমাণ করতো যে, এ বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসেনি, কারণ যদি আল্লাহর আদেশ হতো তাহলে তাতে পরামর্শের কোন প্রশ্নই উঠতো না। এ ধরনের মওকা রাসূল (সঃ)–এর সময় কয়েক বার এসেছে। যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসে দেখতে পাই, বরং সাহাবাগণ তো এ–ও বর্ণনা করেছেন যে, 'আমরা হুজুর (সঃ)–এর চাইতে অধিক পরামর্শকারী আর কাউকেও দেখিনি।' একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এটাও হুজুরের সুন্নাতই ছিলো যে, যে বিষয়ে আল্লাহর কোন নির্দেশ নেই সে বিষয়ের ওপর পরামর্শ করা হোক। অন্য কোন শাসক তো দূরের কথা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সঃ)–ও তাঁর নিজের রায়কে অন্যদের জন্যে অলংঘনীয় ফরমান বলে ঘোষণা করেননি। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)–তাঁর উম্মতকে পরামর্শ ভিত্তিক কাজ

করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, যে বিষয়ে আল্লাহর আদেশ পাওয়া যাবে, বিনাবাক্য ব্যয়ে তা মেনে নিতে হবে এবং যে বিষয়ে আল্লাহর আদেশ পাওয়া না যাবে, সে বিষয়ে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার ব্যবহার কর।

স্বাধীনতার প্রকৃত চার্টার

এটা মানব জাতির জন্যে দেয়া ঐ চার্টার যা দ্বীনে-হক ব্যতীত জগতে আর কেউ তাকে দেয়নি। আল্লাহর বান্দাগণ কেবলমাত্র আল্লাহরই বান্দা হয়ে থাকবে এবং অন্য কারও গোলাম সে হবে না। এমন কি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর বান্দাও সে হবে না। তিনি মানুষকে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুর গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব চিরকালের জন্যে খতম করে দিয়েছেন। সাথে সাথে এক মহা নিয়ামত, যা এ পয়গাম মানুষকে দিয়েছে, তা হচ্ছে এমন এক বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব যা রদবদল করার অধিকার কোন বাদশা, একনায়ক অথবা গণতান্ত্রিক বিধান সভা, এমন কি ইসলাম গ্রহণকারী কোন জাতিকেও দেয়া হয়নি। এ বিধান ভালো-মন্দের স্থায়ী মূল্যায়ন (Permanent Values) মানুষকে দিয়ে থাকে যা পরিবর্তন করে কখনও কোন ভালোকে মন্দ বা মন্দকে ভালো করা যাবে না।

তৃতীয় বিষয় যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তা হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর নিকট জবাবদিহি হবে, তোমাদেরকে এ জগতে লাগামহীন করে সৃষ্টি করা হয়নি যে, মনে যা আসবে তা-ই করতে থাকবে। যা খেতে মন চাইবে তাই খাওয়া শুরু করবে, আর এসব ব্যাপরে তোমাকে জিজ্ঞেস করারও কেউ থাকবে না। বরং তোমার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি বাক্য এবং নিজের সমগ্র স্বাধীন জীবনের কাজের হিসেব নিজের স্রষ্টা

ও মালিকের কাছে দিতে হবে। মৃত্যুর পর আবার তোমাকে জীবিত হতে হবে এবং আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে উপস্থিত হতে হবে। এ এমন এক নৈতিক শক্তি যা মানুষের বিবেকের সাথে যদি একাকার হয়ে যায় তাহলে তার অবস্থা এমন হতে বাধ্য, যেমন তার সাথে সর্বদা এমন এক চৌকিদার লেগে আছে, যে তার প্রতিটি অন্যায় কাজের সময় তাকে হুঁশিয়ার করে দেবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে বিরত করবে।

বাইরে গ্রেফতার করার মত যদি কোন পুলিশ অথবা দমন করার মত কোন সরকার না-ও থাকে তবুও তার ভিতরে এমন এক প্রহরী বসা থাকবে যার গ্রেফতারের ভয়ে সে কখনও নির্জনে বা বনে-জংগলে অথবা অন্ধকারেও আল্লাহর নাফরমানী করার সাহস পাবে না, এর চাইতে বেশী মানুষের চারিত্রিক সংশোধন এবং তার ভিতরে নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করার অন্য কোন উপায় নেই। এছাড়া অন্য যে কোন পন্থাই চারিত্রিক সংশোধনের জন্যে ব্যবহার করা হোক না কেন, এর বেশী হতে পারে না যে, বৈষয়িক দৃষ্টিতে যা ন্যায় কল্যাণকর ও যা অন্যায় ক্ষতিকর, তাকেই ন্যায়-অন্যায় মনে করা হবে। আর ঈমানদারী একটা ভালো পলিসি, এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পলিসি হিসেবে যদি অন্যায় ও বেঈমানী লাভজনক হয় এবং তাতে ক্ষতির কোন ভয় না থাকে তা হলে নিশ্চিন্তে তা করা যেতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গীর ফল তো এ হতে বাধ্য যে, যিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে সৎ তিনিই আবার রাষ্ট্রীয় জীবনে নিকৃষ্টতম বেঈমান, ধোঁকাবাজ, লুণ্ঠনকারী এবং যালেম ও অত্যাচারী, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও কোন কোন বিষয়ে অতি সাধু আবার কোন কোন বিষয়ে অতিশয় বদমাশ। এমনও দেখা যায় যে, একদিকে তো তিনি অতি সৎ ব্যবসায়ী ও চরিত্রবান কিন্তু অন্য দিকে তিনি মদখোর, নারী ধর্ষক, জুয়াড়ী ও নিকৃষ্ট চারিত্রের পর্যটক। এরা বলে যে, মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন আলাদা, ব্যক্তিগত জীবনের কোন দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে যদি কেউ

অঙ্গুলি নির্দেশ করে তখন সে তাকে চট করে বলে, 'নিজের কাজে মন দাও' (Mind your business), এর সম্পূর্ণ বিপরীত পরকালের প্রতি ঈমান বা প্রত্যয়ের ধারণা। যাতে বলা হয় যে, অন্যায় যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন তা অন্যায়ই, বৈষয়িক দৃষ্টিতে তা লাভজনক হোক অথবা ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে জবাব দেয়ার অনুভূতি রাখে তার জীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বলে আলাদা আলাদা কোন বিভাগ হতে পারে না, সে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করলে এজন্যে করে না যে, এসব ভালো পলিসি। বরং ঐ কাজ করার মধ্যেই ঈমানদারী নিহিত আছে এবং সে ধারণাও করতে পারে না যে, সে কোন কাজে কখনও বেঈমানী করতে পারে। তার বিশ্বাস তাকে এ শিক্ষা দেয় যে, তুমি যদি বেঈমানী কর তাহলে জানোয়ারের চাইতেও নিম্নতম পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে। যেমন কোরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে,

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ○ ثم رددنه اسفل سفلين

"আমরা মানুষকে সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টি করেছি অতপর তাকে নিম্নতম পর্যায়ে ফেলে দিয়েছি"।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বে মানুষ এক স্থায়ী চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন অপরিবর্তনীয় বিধানই কেবল পায়নি বরং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র এবং আচার আচরণের জন্যে এমন এক মজবুত খুঁটি পাওয়া গেলো যা কখনও নড়ার মত নয়, যা এ কথারও মুখাপেক্ষী নয় যে, কোন সরকার থাকলে, পুলিশ থাকলে অথবা আইন আদালত থাকলে সে সঠিক পথে চলবে, না হয় অবাধে অপরাধ করতে থাকবে।

বৈরাগ্যের স্থলে দুনিয়াদারীতে সাধুতার ব্যবহার

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাওয়াত আর এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে থাকে এবং তা হচ্ছে এই যে, সদাচার বৈরাগ্যের পর্ণ কুটিরে নয়,

দরবেশের খানকায়ও নয় বরং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মেনে চলার জন্যে। যে আধ্যাত্মিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দুনিয়ার লোকেরা ফকির দরবেশদের মধ্যে তালাশ করতে থাকতো, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তা রাষ্ট্রীয় মসনদে এবং আদালতের আসনে নিয়ে আসেন। তিনিই ব্যবসা-বণিজ্যে আল্লাহভীতি ও দিয়ানতদারীর সাথে কাজ করা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই পুলিশ ও সৈনিকদেরকে 'তাকওয়া' ও 'পরহেজগারীর' সবক দিয়েছেন। তিনিই মানুষের এ ভুল ধারণা নিরসন করেছেন যে, "আল্লাহর ওলী ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়াদারী ত্যাগ করে কেবলমাত্র 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করতে থাকে।" তিনি ঘোষণা করেছেন যে, ওলী একে বলা হয় না, বরং ওলী তাকে বলা হয়, যে শাসক, কাজী, সেনাপতি, দারোগা, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও অন্যান্য বিষয়ে একজন দুনিয়াদার হওয়ার সাথে সাথে ঐ সমস্ত বিষয়েও নিজে একজন আল্লাহভীরু ও দিয়ানতদার প্রমাণিত হবে। সেখানেই তার ঈমানের পরীক্ষা হবে। এভাবেই সদাচার ও আধ্যাত্মিকতাকে বৈরাগ্যের কুটির থেকে বের করে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, বিচারালয় ও যুদ্ধ-সন্ধির ময়দানে নিয়ে আসেন এবং এখানে সচ্চরিত্রের রাজত্ব কায়েম করেন।

হুজুর (সঃ)-এর হেদায়াতের কল্যাণ

এটা তাঁরই নেতৃত্বের ফল ছিলো যে, নবুয়াতের প্রারম্ভে তিনি যাদেরকে ডাকাত হিসেবে পেয়েছেন তাদেরকেই এমন এক অবস্থায় রেখে যান যে, তারা আমানতদার এবং আল্লাহর সৃষ্টির জান-মাল এবং মান-ইজ্জতের রক্ষক হয়ে যায়। যাদেরকে অন্যের অধিকার আদায়কারী, অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং অধিকার আদায়ে সাহায্যকারী বানিয়ে ছাড়েন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়া ঐ সমস্ত শাসকদের দেখেছেন যারা নির্যাতন ও নিষ্পেষণের মাধ্যমে অধীন জনগণকে দাবিয়ে রাখতো এবং গগণ স্পর্শী

বালাখানা থেকে নিজ নিজ প্রভুত্ব চালিয়ে যেতো। তিনিই দুনিয়াকে এমন শাসকের সাথে পরিচিত করান, যে হাটে-বাজারে সাধারণ মানুষের মত চলাফেরা করতো এবং ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে বসে শাসন করতো। তারঁ পূর্বে জগত ঐ সমস্ত সেনাবাহিনীর সাথে পরিচিত ছিলো যারা কোন জনবসতির ওপর পরিচালিত হলে চুর্তদিকে নরহত্যা ও জনবসতিতে অগ্নি সংযোগ করতো এবং বিজিত সম্প্রদায়ের নারীদের শ্লীলতাহানী করতো, তিনিই (নবী) জগতকে এমন এক সেনাবাহিনীর সাথে পরিচয় করান যারা কোন শহরে প্রবেশ করলে শত্রু সৈন্য ব্যতীত অন্য কারও ওপর হাত বাড়াতো না এবং বিজিত এলাকা থেকে যদি তাদেরকে কখনও পশ্চাদপসরণ করতে হতো তাহলে তাদের থেকে আদায় কৃত কর পর্যন্ত ফেরত দিয়ে দিতো। মানব জাতির ইতিহাস দেশ ও নগর বিজয়ের কহিনীতে পরিপূর্ণ কিন্তু মক্কা বিজয়ের তুলনা আপনি কোথাও পাবেন না। যে শহরের মানুষ তের বছর পর্যন্ত হুজুর (সঃ)-এর ওপর যুলুম-নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালিয়ে ছিলো, ঐ শহরেই তিনি (নবী) এমন অবস্থায় প্রবেশ করেন যে, তাঁর মস্তক আল্লাহর সামনে অবনমিত ছিলো। তাঁর কপাল উটের 'কাজোয়ার' সাথে গিয়ে লাগছিলো। তাঁর ব্যবহারে অহংকার ও গর্বের লেশ মাত্র ছিলো না। ঐ সমস্ত লোক যারা তের বছর পর্যন্ত তাঁর ওপর যুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকে, যারা তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং যারা হিজরতের পরও আট বছর পর্যন্ত তাঁর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে রত ছিলো, যখন তারা বিজিত হয়ে তাঁর সামনে হাজির হলো, ক্ষমা ও করুণার জন্যে দরখাস্ত করলো, তখন তিনি প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ঘোষণা করলেনঃ

لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء

আজ তোমাদেরকে ধরা হবে না, যাও তোমরা মুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ মহত্ত্বের যে প্রভাব তাঁর উম্মতের ওপর পড়েছে তার নিদর্শন যদি কেউ দেখতে চায়, তাহলে ইতিহাস খুঁলে সে দেখে নিক যে, মুসলমানগণ যখন স্পেন জয় করে তখন তাদের ব্যবহার কেমন ছিলো। আর খৃষ্টানরা যখন তাদের ওপর বিজয় লাভ করে তখন তাদের সাথে কি ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলমানগণ যখন বায়তুল মোকাদ্দাস তাদের থেকে মুক্ত করে তখন খৃষ্টানদের সাথে তাদের কি ব্যবহার ছিলো। আর ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় খৃষ্টানরা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করে তখনই-বা তারা মুসলমানদের সাথে কি ব্যবহার করেছিলো।

সুধীবৃন্দ। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন-কথা এক মহাসমুদ্র যা সীমাবদ্ধ করা একখানি বিরাট গ্রন্থেও সম্ভব নয়। এক বক্তৃতায় কি করে তা সম্ভব! তবুও আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে তার কয়েকটি বিশেষ দিক আলোচনা করলাম। তারাই হবে সৌভাগ্যেবান য়ারা এ একমাত্র হেদায়াতের উৎস থেকে পথের সন্ধান পেতে চায়।

ওয়া-আখেরো দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন

সমাপ্ত